অনিশ্চয়তার সপক্ষে………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



বাস্তবিকই, আমরা চলেছি এক মহা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা নতুন কিছু নয় যদিও। আপনি যেমন নিশ্চিত নন আপনার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে, তেমনি জীবনযাত্রার পদে পদে কর্মজীবনে নিশ্চিত নন আপনার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কেও। মানুষ মোটামুটি একটা ঘোরের মধ্যে জীবনযাপন করে, একটা বিস্মৃতি, একটা স্বপ্ন দিয়ে মুড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে যায় এবং ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যেও একটি নিশ্চিন্তা, একটা আশা জাগিয়ে রাখতে চায়। নিশ্চয়তার এই আশা থেকেই বোধ হয় সৃষ্টি করে সে মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন, আরেকটি লোক, যা এই পৃথিবীরই একটি অনুরূপ।  
যুক্তিতর্ক এবং বাস্তবতা জ্ঞানের বড়াই করে যে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি, সেই জাতিও সবসময় ভূগতো এক অনিশ্চয়তাবোধে। মধ্যযুগে যখন তাদের দেশে খ্রিষ্টধর্ম গিয়ে হাজির হয় তখন নর্থামব্রিয়ার রাজা এডউইন তার পুরোহিতের পরামর্শ চাইলেন নতুন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে। পৌত্তলিক পুরোহিত তখন বললেন, যেহেতু মানুষ জানে না কোত্থেকে সে আসে আর যায়ই বা কোথায় অর্থাৎ জীবনটা পুরোপুরিই এক অনিশ্চয়তায় মোড়া এবং যেহেতু এই নতুন ধর্ম নিশ্চিত করে বলে মানুষ কোত্থেকে আসে আর কোথায় যায় সেজন্য এই নবধর্মে দীক্ষালাভই সম্ভবত শ্রেয়। সেই পুরোহিত সুন্দর একটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টি রাজাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, জীবন একটি চড়ূই পাখি। কোনো এক ঝড়ের রাতে বাইরের অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোকময় এক গৃহে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করে, তড়পায়, এরপর আরেক জানালা দিয়ে অন্ধকার ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে যায়। তো এই বিশ্বাসের প্রতিকূলে যখন নতুন ধর্ম নিশ্চিত করে বলে যে জন্মের আগেও যেমন মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি মৃত্যুর পরও অস্তিত্বের নিশ্চয়তা আছে, তখন নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়াটাই বিবেচনা বোধের পরিচায়ক। এভাবে কেবল মধ্যযুগেই নয়, প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের নিত্য সহচর হচ্ছে এই অনিশ্চয়তার এবং মানুষের যাবতীয় সু ও কুকর্মের পেছনেও দেখতে পাই এর ইন্ধন।  
আসলে অনিশ্চয়তা থেকেই জন্মে অসহায়ত্ব। মহাবিশ্ব, মহানৈঃশব্দ্যের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে মানুষের অসহায়ত্ব এবং জীবনের অর্থহীনতা ফুটে ওঠে আরও স্পষ্ট হয়ে। আসলে আমরা কী? মহাকালের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, কীটানুকীট ছাড়া কী? রবীন্দ্রনাথের গানে আছে এই বিশ্ব একটা বিন্দুর মতো, খাবি খেতে খেতে ভেসে চলছে দারুণ অন্ধকার মহাসমুদ্রে। জানে না তার শেষ কোথায়, সময়ের শেষ কোথায়, স্থানের শেষ, সীমার শেষ কোথায়। জোসেফ ক্যাম্পবেলে এ ধরনের অনিশ্চয়তার একটা বর্ণনা দিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই অবস্থাকে মেনে নেওয়ার। মানুষ অন্য আর সব কিছুর মতোই এই মহাকাশের মহাকালের একটি অংশ। যে অর্থহীন সংগ্রামে ব্রহ্মাণ্ড নিয়োজিত, সেই একই সংগ্রামের সে একজন অতি ক্ষুদ্র যোদ্ধা। এই অস্তিত্বের লড়াই যতই হাস্যকর হোক, একে সম্বল করে, একেই মহিমাদান করে আমরা বাঁচতে চাই।  
অনিশ্চয়তা মূলত একটি অ্যান্টিথিসিস, নিশ্চয়তার এন্টিথিসিস। একে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। দ্বান্দ্বিকতা সমস্ত জীবনের, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপকরণের স্রষ্টা। হেরাক্লাইটাস যেমন পরিবর্তনের কথা বলে আছে-নাইয়ে জীবনের সত্য খুঁজেছেন, হেগেল যেমন দ্বান্দ্বিকতার চিন্তায় এক ধরনের আধ্যাত্মবাদে আশ্রয় নিয়েছেন; মার্ক্স-এঙ্গেলস যেমন বস্তুবাদে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের বাস্তব জীবনের সংগ্রামের কথা বলেছেন; কাজানজাকিস যেমন দ্বান্দ্বিক মরমিবাদ কিংবা অধিবিদ্যায় আশ্রয় নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন, তেমনি আমাদের রবীন্দ্রনাথও চেয়েছেন জন্ম-মৃত্যু-যোগ-বিয়োগের ভেতর একটি মেলবন্ধন। সেইখানে তিনি প্রাণ মেলাতে চেয়েছেন যে সমুদ্রে আছে-নাই এক হয়ে রয়েছে সমান। একবিংশ শতকে এসে মানবজাতি এরকম একটি সর্বব্যাপী এন্টিথিসিসের মধ্য দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। এই এন্টিথিসিসের নাম করোনা। তস্যাতিতস্য একটি অদৃশ্য অণুকণা যে এতো শক্তিশালী হতে পারে তা মানুষের জানা ছিল না। চীনে প্রথম আবিস্কারের পর এটা দ্রুত ইউরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এটাকে চীনের গবেষণাগারে প্রস্তুত একটি প্রাণঘাতী অণু বলে দোষারোপ করলে চীনা অণুবিদ বলেছিলেন যে, এত মারাত্মক শক্তিশালী ভাইরাস কেবল প্রকৃতিই সৃষ্টি করতে পারে, মানুষের গবেষণাগারে তা সৃষ্টি সম্ভব নয়। কথাটায় প্রকৃতির মহাশক্তিমত্তার বিপরীতে অনিশ্চয়তা এবং সেই সঙ্গে মানুষের অসহায়ত্ব বোধ ফুটে ওঠে। সত্যিই মানুষ কী? সময়ের অতি নগণ্য ভগ্নাংশে ফালপাড়া এক কীট যে দাপানো শেষে নিজেই হয়ে যায় পোকার খাদ্য।  
কিন্তু না, করোনাকালের এই বিশাল নৈরাশ্যবোধের আত্মসমর্পণ করা আত্মহত্যারই সামিল। এর মাঝেও আমাদের নিজেদের শক্তিতে আস্থা হারানো চলবে না, কারণ সব এন্টিথিসিসেই একটি সিন্থিসিসের রুপালি রেখা থাকে। এবং সব দুঃখ রাতেই জ্বলে মঙ্গল প্রদীপ, সব নৈরাশ্যময় যুগেই জন্মে সবচেয়ে আশাবাদী সাহিত্য। সেই আশাবাদ খুঁজতে গিয়ে দেখি মানুষ যেমন ওষুধ আবিস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে করোনার প্রতিষেধক তৈরি করছে, তেমনি ব্যক্তিগত চলন-বলনে, আচার-আচরণে আয়-ব্যয়ে আনছে কিছুটা সভ্যতা। কিংবা হয়তো এভাবে সভ্য হওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পুঁজিবাদ, খোলাবাজার অর্থনীতি, ভোগ-বিলাস ইত্যাদি মানুষের জীবনে যে দুরাচার, ব্যভিচার আর অত্যাচারের জন্ম দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েও যদি মানুষ একটু সংযমী হয়, সভ্যভব্য আচরণ করে, অন্যের প্রতি বিবেচনাবোধ জাগিয়ে একটু যত্নবান হয়, তাহলে সেটাও হবে করোনার অনিশ্চয়তায় একটা বড় পাওয়া।